যায়যায়দিন

তারিখ 27 FEB 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

আমাদের সংস্কৃতির পাঠশালা: বইমেলা

রেজাউদ্দিন স্টালিন

বইমেলা পৃথিবীর অনেক দেশে হয়। তার মধ্যে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা, ভারতে কলকাতার পুস্তক মেলা এবং বাংলাদেশের একুশের বইমেলা সবিশেষ উল্লেখ করা যায়। তবে অন্যান্য মেলার চেয়ে বাংলাদেশের একুশের বইমেলার ভিন্ন চারিত্র, ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত। ভাষার জন্য আর কোনো জাতিকে এমন রক্ত দিতে হয়নি। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না, এখন পর্যন্ত বাংলাভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের সচেতন সমাজকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। বিশেষ করে যারা লেখক-পাঠক এবং প্রকাশক তাদের। মাতৃভাষা রক্ষা আন্দোলনে একুশের বইমেলা একটা সহায়ক শক্তি। সারা পৃথিবীর জনসংখ্যার হিসাবে বাংলা এখন চতুর্থ ভাষা। এছাড়া আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি জুটেছে আমাদের কপালে। বাংলা ভাষা রক্ষার আন্দোলন ১৯৫২ সালে দুর্নিবার বেগে শুরু হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তারও আগে বাংলাভাষা বিদেশি বেনিয়াশক্তির দ্বারা হুমকিগ্রস্ত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কবি আবদুল হাকিমকে এজন্যই লিখতে হয়েছিল- 'যে জন বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী/ সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি'। কবির এ উচ্চারণের ভেতর দিয়ে শুরু হয়েছিল ভাষা আন্দোলন এবং তার প্রস্তুতি। দরিদ্র এবং উন্নয়নশীল দেশের আর্থসামাজিক ব্যবস্থা যেমন নানামুখী ভাঙনের শিকার হয় তেমন আগ্রাসনের শিকার হয়েছে এ ভূখণ্ড বারবার। মাথানত না করার যে স্পর্ধা তা যথার্থ অর্থে প্রদর্শন করেছে এদেশের জনগণ। এ কথা সত্য, মাথানত না করতে দীক্ষা পেয়েছি আমরা মাতৃভাষা রক্ষার যুদ্ধ থেকে এবং সে অর্থে, একুশের বইমেলা এবং আর্থ-রাজনৈতিক অনুশাসন। যতোদূর জানা যায় স্বাধীনতার পরপরই বাংলা একাডেমীর চত্বরে শ্রদ্ধেয় প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহা তার প্রকাশনী সংস্থা মুক্তধারার বই নিয়ে বসেছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল সদ্য স্বাধীন দেশের মানুষকে গ্রন্থপাঠে এবং গ্রন্থপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা। তিনি চেষ্টা চালিয়ে সফলও হয়েছিলেন সত্তরের দশক থেকেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকলো একুশের বইমেলা। জাতি তার নিজের প্রয়োজনে এ বইমেলাকে ঘিরে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো। আজ তিন দশকের পথ পরিক্রমায় একুশের বইমেলা বিশ্ববাসীর সামনে এক দৃষ্টান্ত। এ করপোরেট যুগে শুধু বইমেলাকে ঘিরে এতো নান্দনিক আয়োজন হতে পারে তাও আবার বাণিজ্যভিত্তিক সেটাই আশার কথা। যারা জ্ঞানচর্চার আধার, গ্রন্থকে রুটি রুজির বাহন করে নিতে চাইছেন তাদের প্রতি আমার অকৃত্রিম ভালোবাসা।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, প্রতিবছরই বইমেলায় বিক্রি বাড়ছে। ২০০৮ সালে এ মেলায় সর্বমোট বিক্রি ছিল ২০ কোটি টাকা। ২০০৯ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৪০ কোটি টাকা। ২০০৯ সালে মোট গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে পাঁচ শতাধিক, বেশি উপন্যাস এবং কবিতাগ্রন্থ, প্রবন্ধ, শিশুতোষ গ্রন্থ, রম্যরচনা, গবেষণামূলক গ্রন্থ, অনুবাদগ্রন্থ, গল্প, সঙ্কলন প্রায় সব শাখার বই কমবেশি বেরিয়েছে। দেশের প্রথিতযশা কবি-লেখকরা প্রতিদিন বইমেলায় আসেন এবং ক্রেতাদের অটোগ্রাফ দেন। এ জনপ্রিয় ধারার অর্থাৎ যাদের বই বেশি বিক্রি হয় তারা হলেন রাহাত খান, সৈয়দ শামসুল হক, হুমায়ুন আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন, আনিসুল হক প্রমুখ। কবিতার বই বেশি বিক্রি হচ্ছে কবি আল মাহমুদ, নির্মলেন্দু গুণ, রফিক আজাদের। প্রবন্ধগ্রন্থ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বদরুদ্দীন উমর প্রমুখের। এবারের বইমেলার আলোচ্যগ্রন্থ ছিল সেনাপ্রধান লে. জে. মইন উ আহমেদের 'শান্তির স্বপ্নে'। জানা গেছে, সমগ্র বইমেলায় বইটি ১০ হাজার কপি বিক্রি হয়েছে। এজন্য সর্বোচ্চ সম্মানী লাভ করেছেন তিনি। বাংলা একাডেমী-জাতির মননের প্রতীক' এবং স্লোগান নিয়ে তাৎপর্য ও মহিমার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটেছে বইমেলাকে কেন্দ্র করে। দূর-দূরান্ত থেকে আসেন জ্ঞানপিপাসু পাঠকরা। তারা নিজেদের প্রকাশিত [illegible] আসেন। এ এক মিলনমেলা। আজ আর অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই যে, ১ বৈশাখ, ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর, ২১ ফেব্রুয়ারি এসব জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসের সঙ্গে একুশের বইমেলার নাড়ির যোগ হয়ে গেছে। একুশের বইমেলা ছাড়া আমরা আজ আর ফেব্রুয়ারি মাসকে ভাবতে পারি না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি। দেশের বড় আমলা, মন্ত্রী কিংবা এনজিও সেক্টরের কর্মকর্তা সবাই একেকটি গ্রন্থ রচনার জন্য ফেব্রুয়ারি মাসে তৎপর হয়ে ওঠেন। এটা জ্ঞানকেন্দ্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার একটা শুভ প্রয়াস। গ্রন্থ হচ্ছে মোহিত করা সব মানুষের আত্মার আধার। স্পর্শ করলেই তারা বেরিয়ে এসে কথা বলে পাঠকের সঙ্গে। এ অত্যাশ্চর্য সত্য ঘটনা আর কোনো মাধ্যমে ঘটে না। যখন যে কোনো অবস্থায় একজন পাঠক বইকে নিজের অভিজ্ঞতার অংশ করে নিতে পারে, ব্যবহার করতে পারে। আর কোনো মাধ্যমে এতোটা আন্তরিক হওয়া যায় না। বইমেলা নতুন যে উদ্দীপনার কাজ করে তা হলো প্রতি বছর নতুন কিছু চিন্তা ও অভিজ্ঞতা আমাদের উপহার দেয়। গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর সবচেয়ে বড় যে বিষয় তা হচ্ছে জ্ঞানচর্চা। বইমেলা অন্যের মতকে সহ্য করার ও গ্রহণ করার ক্ষমতা ও ধৈর্য সৃষ্টি করে। গ্লোবালাইজেশনের এ যুগে একজন মানুষের মধ্যে যে অপরিমেয় শক্তি আছে তাকে আবিষ্কার ও প্রেরণা দেয়ার ট্র্যাডিশন সাম্প্রতিককালে শিথিল হয়ে আসছে। বলা হচ্ছে, মানুষ আর একা মানুষ নয়, সবাই মিলে একটা মানুষ। এটা একার্থে সত্য হলেও এর রয়েছে ভিন্ন আরেক পিঠ। যেখানে একজন মানুষ নেতৃত্ব দেবে, সুনাগরিক হবে, কবি, রাজনীতিবিদ, ক্রীড়াবিদ, বিজ্ঞানী, চিত্রকর, চলচ্চিত্র নির্মাতা হবে। তার রয়েছে আলাদা চিন্তা করার শক্তি ও মৌলিক জিজ্ঞাসা। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে যেমন লাইব্রেরি তেমন বইমেলা এবং লাইব্রেরি সমার্থক। দেশের রাজধানীতে শুধু নয়, এই মেলা বিভাগীয় জেলা, উপজেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিকশিত হতে দিতে হবে। এছাড়া প্রকাশকরা বইমেলাকে বড় বড় মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুল পর্যায়ে মেলা আয়োজন করুক এটা আমরা চাই। শুধু টেক্সট বুকবোর্ডের বই পড়ে পরীক্ষা দিয়ে কেরানি বা বড় আমলা কিংবা ব্যাংকার হয়তো হওয়া যায়। তবে বড় মানুষ কিংবা নেতা-লেখক-বিজ্ঞানী হওয়া যায় না। আজ যদি আমরা লক্ষ করি, দেখবো দেশে আগামী ২০২৫ সালে নেতৃত্বশূন্যতার সৃষ্টি হবে। আর যারা নেতৃত্বে আসবে তারা কি অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হতে পারবে? কারণ এই জেনারেশনকে ডিজুস জেনারেশন বলা হচ্ছে। অনেকেই বাংলা ভাষার উচ্চারণ করছে ইংরেজি আঙ্গিকে। এ ধরনের অপপ্রয়োগ শুধু জাতির জন্য ক্ষতিকর নয় তা সমগ্র ভাষার প্রতিও একটা আঘাত। যে ভাষা মানুষের মুখের দৈনন্দিন উচ্চারণের কাছাকাছি থাকে না সে ভাষার মৃত্যু হয়। পৃথিবীতে এ কারণে বহু ভাষার মৃত্যু হয়েছে। আজ সেই ইতিহাসের শিক্ষাকে কাজে লাগাতে হবে। বাংলাকে সর্বত্র প্রয়োগ করতে হবে। শুদ্ধ ভাষায় বাংলা বলা ও লেখার প্রচলন বৃদ্ধি করতে হবে। আমরা যারা সৃজনশীল কাজ করি তাদের জন্য এটি একটি অনুশাসনের মতো। চারদিকে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে। সেখানে লেখাপড়া শিখে ব্যাংকার কিংবা একটি বেসরকারি কোম্পানির চাকরি পাওয়ার স্বপ্ন অনেকের চোখে-মুখে। অসহায় পিতা-মাতা ইচ্ছার বিরুদ্ধে সন্তানদের ইংরেজি মিডিয়ামে ভর্তি করছে। না হলে সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যৎ কী? আরেক শ্রেণী আছে যারা স্ট্যাটাস বিবেচনা করছে। বুর্জোয়া মানসিকতার অর্ধশিক্ষিত লোকেরা নিজের ভাষার মর্যাদা কি তা বোঝে না। এ জন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে যে নানা বৈষম্য তা দূর না করলে বাংলাভাষা সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা দেয়া সম্ভব নয়। ইংরেজি শেখার প্রয়োজন আছে তবে ভালো করে বাংলা শেখার পর। এ তাৎপর্য এবং সত্য উপলব্ধি করানোর এ কথা বড় উপায় হতে পারে একুশে বইমেলা। আমরা বইমেলাকে শু বই বিক্রির কেন্দ্রস্থল হিসেবে দেখলে ভুল করবো। বরং আমাদে মানসিক দৈন্য ঘোচানোর একটি পাঠশালা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। বাংলা একাডেমীতে বইমেল এখন শুধু বাংলা একাডেমীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, তা হয়ে উঠেছে সমগ্র জাতির পাঠ্যাভ্যাস বৃদ্ধির একটা কর্মশালা। মেলাকে কেন্দ্র করে আয়োজিত হয় নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন। এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নতুন লেখক তৈরির এবং তাদের অনুপ্রাণিত করার একটা প্লাটফর্ম। প্রতি বছর বাংলা একাডেমী বাংলা ভাষার লেখকদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরস্কার দিয়ে থাকে। এ পুরস্কারের অর্থমান খুবই নগণ্য। আমরা মনে করি এ পুরস্কারের অর্থমূল্য ৫ লাখ টাকা হওয়া উচিত। একজন লেখক সারাজীবন সাহিত্য সাধনা করে যদি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ না লাভ করেন তবে তা দুঃখের। বাংলাভাষার চর্চা এবং একুশের বইমেলা এখন কোনো আনন্দ-উৎসব নয় এবং মার্কসের সেই বিখ্যাত উক্তি তা এখন প্রয়োজনের বৃত্ত থেকে প্রত্যাশার বৃত্তের দিকে যাচ্ছে।

বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণ ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছে। আমাদের দরকার আরো বড় স্পেস। সেক্ষেত্রে পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করে মাঠের পরিসর বাড়ানো যায়। প্রয়োজনে টিএসসি চত্বর পর্যন্ত বিস্তৃত করা যায়। কলকাতা পুস্তক মেলার মডেলে আরো কয়েকটি মঞ্চ করা যায়। লিটল ম্যাগাজিন সাহিত্যের প্রাণ। আমরা আরো বড় জায়গায় নিয়ে যেতে পারি লিটল ম্যাগাজিনের স্টলগুলোকে। সৃষ্টির মূলে তারুণ্যের শক্তি, এ তারুণ্যের শক্তিকে জ্ঞানকেন্দ্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যবহার করা এখন আমাদের কর্তব্য। বইমেলাকে রাখতে হবে সব অপচ্ছায়া ও দুর্নীতির বাইরে। একুশের বইমেলা আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির শেষ আশ্রয়, আমাদের মানস গঠনের নান্দনিক অনুশাসন।

রেজাউদ্দিন স্টালিন: কবি ও উপস্থাপক।

> বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণ ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছে। আমাদের দরকার আরো বড় স্পেস। সেক্ষেত্রে পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করে মাঠের পরিসর বাড়ানো যায়। প্রয়োজনে টিএসসি চত্বর পর্যন্ত বিস্তৃত করা যায়। কলকাতা পুস্তক মেলার মডেলে আরো কয়েকটি মঞ্চ করা যায়। লিটল ম্যাগাজিন সাহিত্যের প্রাণ। আমরা আরো বড় জায়গায় নিয়ে যেতে পারি লিটল ম্যাগাজিনের স্টলগুলোকে। সৃষ্টির মূলে তারুণ্যের শক্তি, এ তারুণ্যের শক্তিকে জ্ঞানকেন্দ্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যবহার করা এখন আমাদের কর্তব্য। বইমেলাকে রাখতে হবে সব অপচ্ছায়া ও দুর্নীতির বাইরে। একুশের বইমেলা আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির শেষ আশ্রয়, আমাদের মানস গঠনের নান্দনিক অনুশাসন।